অজয় দাশগুপ্ত

ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ও এজেন্ডা

নতুন বছরের শুরুতে দেশের দুটি প্রধান ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। ছাত্রদল জানুয়ারির প্রথম দিনে এবং ছাত্রলীগ ৪ জানুয়ারি। এ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রমজানের ছুটির কারণে বন্ধ ছিল। তবে দুটি সংগঠনই এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ছাত্রলীগ এখন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন। আর ছাত্রদল প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন।

গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হচ্ছে না। নির্বাচন ব্যাপক সহিংসতা সৃষ্টি করতে পারে এমন আশঙ্কা সঙ্গতভাবেই করা হয়। আর এতে জড়িত হয়ে পড়বে প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এমনটি কি তাদের প্রধান ছাত্র সংগঠন হিসাবে পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? শিক্ষাঙ্গনে যাতে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীরা যাতে অবাধে মতামত দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করাটাই তাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এটা আপাতত হওয়ার নয় বলেই অনেকে মনে করেন।

আমাদের দেশে ছাত্র আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যের কথা বারবার স্মরণ করা হয়। অনেকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মত ছাত্র আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর শপথ ব্যক্ত করেন। আশির দশকেও এইচএম এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ ২০-২২টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্য ১৯৯০ সালে এই স্বৈরশাসকের পতনে অবদান রাখে। একবিংশ শতাব্দীতে কি এ ধরনের প্রবল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠবে? এ ধরনের আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে কি আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বৈরশাসনে? এমন অমানিশার যুগে ফেরার দুর্ভাগ্য যেন বাংলাদেশে নেমে না আসে।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৫টি পদের কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয় ডিসেম্বরের শেষদিকে। এরপর সংগঠনের অভ্যন্তরে যে তোলপাড় চলছে, তেমনটি অতীতে কোনও সংগঠনের ইতিহাসে দেখা যায়নি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে মনে হচ্ছে, বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বা সুপ্রিম কমান্ডার বেগম খালেদা জিয়ার ঘোষিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ছাত্রদলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা-কর্মী মেনে নিতে রাজি নন। তারা এ দু'জনকে বলছেন সন্ত্রাসী, অছাত্র এবং বিবাহিত ও সন্তানের জনক। ঘোষিত কমিটির শীর্ষ কর্মকর্তারা চাচ্ছেন, তাদের বিরোধী পক্ষের বহিষ্কার। পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও ছাত্রদলে থাকতে চাচ্ছে উভয়পক্ষই। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা প্রকাশেও উভয়পক্ষ স্পষ্টভাষী। এ পরিস্থিতি বেগম জিয়ার জন্য বেশ উৎসাহজনক, তাতে সন্দেহ নেই। তবে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে, যার ঘোষিত কমিটিকে ছাত্রদলকে ধ্বংস করে ফেলার পদক্ষেপ হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা অটুট থাকে কি করে?

আমাদের দেশে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিভক্তির বেশ কয়েকটি নজির আছে। ষাটের দশকে ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া ও মেনন গ্রুপে বিভক্তি ঘটেছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মতো বিরোধের পটভূমিতে। পরে তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। মস্কো ও পিকিংয়ের অনুসারী এ দেশের কমিউনিস্ট নেতারা ছাত্রদের মধ্যে নিজস্ব অনুসারীদের পৃথকভাবে সংগঠিত করার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ভেঙে একবার জাসদের এবং আরেকবার বাকশালের জন্ম হয়। উভয় দলের নেতারা ছাত্রদের মধ্যেও নিজস্ব গ্রুপ চাইছিলেন এবং এ কারণে ছাত্রলীগে বিভক্তি ঘটান। তবে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের অনুগামী ছাত্রলীগই প্রধান সংগঠন হিসাবে টিকে থাকে।

ছাত্রদল বিকশিত হয় আশির দশকে। নব্বইয়ের দশকেও তার জনপ্রিয়তা ছিল। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন হিসাবেই এর জন্ম। আমাদের দেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ বলিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সামরিক শাসকের গড়ে তোলা দলের ছাত্র সংগঠনের টানা দীর্ঘ দু'দশক জনপ্রিয় থাকার ঘটনা বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের দীর্ঘ দিনের অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার প্রতিও এ সংগঠনের কোনও রকম আনুগত্য নেই। ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল যে ভূমিকার কথা আমরা স্মরণ করি, তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অবস্থানকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অতীতে কোনও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে ঐক্য গড়েনি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর আলবদর-রাজাকার হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পর এটা একেবারেই অসম্ভব মনে হয়েছে। কিন্তু ছাত্রদল ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ঐক্যজোট গঠন করেছে। ছাত্র সমাজকে তা সরকার বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ছাত্রদলের এ সিদ্ধান্ত কি উদ্বেগজনক নয়?

> *শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী শিক্ষার মানোন্নয়ন, নকল প্রতিরোধ, বয়স্কদের শিক্ষাদান প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে সংগঠিতভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টিতে তারা অবদান রাখতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার কাজেও তাদের অংশগ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের এজেন্ডায় এসব একেবারেই অনুপস্থিত বলে মনে হচ্ছে। তাদের কাছে মূল এজেন্ডা হচ্ছে, মূল দলের ক্ষমতার রাজনীতি।*

ছাত্রদলে ছাত্র ও অছাত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিবাহিত-অবিবাহিত নিয়েও নানা কথা আছে। ষাটের দশকে ক'জন ছাত্রনেতা বিবাহিত ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে বিয়ের পর ছাত্র আন্দোলনে থাকার কথা ভাবাই যেত না। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের কেবল একজন শীর্ষনেতা বিবাহিত ছিলেন। এটা নিয়ে ওই সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরই হাস্য-কৌতুক করতে দেখেছি। তবে বর্তমান সময়ে শুধু বিবাহিত নয়, ছাত্র সংগঠনের কমিটিতে থাকার জন্য অছাত্র আরও অনেকেই আগ্রহী। যে কোনও ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে নয়, তারা চায় প্রভাবশালী সংগঠনের নেতৃত্বে থাকতে। প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয়, বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটির প্রধান কর্মকর্তাদের ওপর একটি জরিপ করা যেতে পারে। আমার ধারণা, এসব কমিটিতে এখন নিয়মিত ছাত্রদের স্থান হয় কদাচিৎ। অছাত্রদের দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে তারা। ৩৫-৪০ বছরেও ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তা হচ্ছে একদল। সম্প্রতি শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের একটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক অনুষ্ঠানে। তিনি প্রায় ৭ বছর একই দায়িত্বে আছেন। এ সময়ে কোনও সম্মেলন করা যায়নি পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক কে হবে, সে বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ার কারণে। তবে সভাপতি পদে তার নির্বাচন নিশ্চিত। এ পদে আসীন হলে কতদিন দায়িত্ব পালন করবেন, কে জানে?

যাদের নামে সন্ত্রাসের অভিযোগ আছে, যারা ব্যবসা বা কন্ট্রাক্টরি করেন কিংবা নিয়োজিত আছেন চোরাচালানির সঙ্গে, তারাও কি ছাত্র সংগঠনের কমিটিতে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করেন না? অতীতে দেখেছি, এ ধরনের কিছু লোকের প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনে প্রশ্রয় পেলেও কমিটিতে স্থান মিলত না। কিন্তু এখন মেলে। এরা মনে করে, অপরাধীর পরিচয় আড়াল করার জন্য একটি সংগঠনের কমিটির কর্মকর্তার পদ দখল করা হচ্ছে ভাল উপায়। এতে আইনের হাত থেকে যেমন রেহাই পাওয়া সহজ হয়, তেমনি সমাজের ঘৃণা-রোষও মোকাবিলা করা যায়। একজন মাস্তান বা চোরাকারবারি গ্রেফতার হলে তার পক্ষে কোনও রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠন দাঁড়াবে না। কিন্তু একই সঙ্গে তার পরিচয় যদি থাকে কোনও সংগঠনের কর্মকর্তা হিসাবে, তাহলে পক্ষে দাঁড়াতেই হবে।

প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন এ অসৎ প্রবণতা থেকে কতটা মুক্ত, সে প্রশ্ন করাই যায়।

আমাদের দেশে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজন এখনও আছে বলেই আমি মনে করি। শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী শিক্ষার মানোন্নয়ন, নকল প্রতিরোধ, বয়স্কদের শিক্ষাদান প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে সংগঠিতভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টিতে তারা অবদান রাখতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার কাজেও তাদের অংশগ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের এজেন্ডায় এসব একেবারেই অনুপস্থিত বলে মনে হচ্ছে। তাদের কাছে মূল এজেন্ডা হচ্ছে, মূল দলের ক্ষমতার রাজনীতি। একই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আসার জন্য দুষ্টমতি অছাত্রদের তৎপরতা। তারা সফলও হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের স্বার্থে ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার চেষ্টা একেবারেই ক্ষীণ। ছোট যেসব ছাত্র সংগঠন সক্রিয়, তারাও রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। ছাত্রদলে দ্বন্দ্ব আছে, কোন্দল আছে। খুনাখুনির ঘটনাও ঘটছে। ছাত্রলীগেও তা আছে। বিভিন্ন স্থানে অন্তর্দলীয় সংঘাতে খুনাখুনির খবর সংবাদপত্রে নিয়মিতই দেখা যায়। ছাত্র সমাজের স্বার্থের কোনও ইস্যুতে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়; ব্যবসায়িক স্বার্থ কিংবা মূল দলের নেতাদের প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবেই তাদের এমন আচরণ। সরকার বলছে, নিরক্ষরতা দূর করার কথা। কিন্তু সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন কি এ কাজ করছে? সরকার পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে চায়? কিন্তু সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন কি এতে সহায়তা দিচ্ছে?

এর অবসান ঘটানো গেলে ছাত্র আন্দোলনের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। রাজনীতির সুস্থতার জন্যও তা প্রয়োজন। রাজনীতির হীন স্বার্থে কেন আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজকে ব্যবহার করা হবে? তাদের তো ব্যস্ত থাকার কথা জ্ঞান অর্জনের জন্য। আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত ও প্রয়োগ করার জন্য, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করার জন্য।

আবার ফিরে যাই জরিপের প্রসঙ্গে। কারা এখন প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বে আছে, তাদের মধ্যে জরিপের পাশাপাশি আমাদের আরও জানা দরকার, ক'টা ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ক'টায় হচ্ছে না। ছাত্র সংসদের নির্বাচনে নিয়মিত ছাত্ররা ভিপি, জিএস-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাচ্ছে কিনা, নাকি এখানেও 'অছাত্রদের' দাপট সেটাও জানা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রকৃত ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব জানা। কোন ইস্যু তাদের কাছে প্রধান, সেটা প্রকাশের সুযোগ কে করে দেবে?

অজয় দাশগুপ্ত : *সাংবাদিক*